Vol. 36 | No. 3 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শাক্তসঙ্গীত ও ভবা পাগলার গান

Volume	36
Issue	3
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী
Published online	June 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i3.13
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i3.13
Pages	231-238
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শাক্তসঙ্গীত ও ভবাপাগলার গান

গোপিকারঞ্জনচক্রবর্তী

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, 'মধ্যযুগের বাংলার যে সামাজিক পরিবেশ হইতে বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজজীবনে অস্তিত্বরক্ষা করিতে পারিল না। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা এবং শাক্ত সাহিত্যের ধারা উভয়ই শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের প্রবাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিতর দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার মত ইহাদের আর কোন শক্তি ছিল না।'[১] এমনই এক অবক্ষয়ের যুগে মাতৃসংগীত নিয়ে রামপ্রসাদ সেনের বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ। তখন বাংলা সংস্কৃতি-অঙ্গন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, রামপ্রসাদের মাতৃসংগীতগুলির মধ্যে জীবনের বাস্তব চিত্র যে ভাবে ফুটে উঠেছে তা পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে দুর্লভ। রামপ্রসাদের গানের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা* গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, "রাম প্রসাদের শ্যামা সংগীত এক সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর প্রসাদীসুর বাঙালীকে মুগ্ধ করেছিল।'[২]

বাংলা সাহিত্যে 'পদাবলী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন দ্বাদশ শতকের কবি শ্রীজয়দেব। তারপর মধ্যযুগের কবিদের রচনার সহায়ক হিসেবে এই 'পদাবলী' শব্দটি সংযোজন করে দেওয়া হয়।

তবে শাক্ত পদাবলীর জন্ম কবে হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কিন্তু আধুনিক শাক্ত পদাবলীর প্রবর্তক রামপ্রসাদ সেন, সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত। তাঁকে অনুসরণ করেই পরবর্তী মাতৃসংগীতের ধারার প্রবর্তনা। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ চৌধুরী, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, দাশরথী রায় প্রভৃতি মাতৃসাধক কবিগণ এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেন। ভবাপাগলার মাতৃসংগীত এই সঙ্গীত ধারায় নতুন সংযোজন। তাছাড়া ভবাপাগলা নিজেও সাধনার জগতে আপনাকে রাম প্রসাদ, কমলা কান্তের-উত্তর সাধক হিসেবে দাবী করতেন। এরূপ দাবী সম্বলিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হল:

ক্ষ্যাপা বেটী ক্ষ্যাপার বুকে খেলছে কত যুগে যুগে।
কতজনা ডাকছে তাঁকে, যার যেমন মনে লাগে।।

বীরভুম বাসা ক্ষ্যাপার উপসনায়।
কুকুর ছানা সঙ্গে খেলায়।
রমার হাড়ের কুড়ে খানায়।
শ্যামা নাকি থাকতো জেগে।।

হালিশহর রাম প্রসাদের গানের ছন্দে।
বেটী নাকি বেড়া বান্দে।।।
স্নানের ঘাটে বলে আনন্দে,
গান শুনাবি ওরে মেগে।।

বর্ধমান কমলা কান্তেরই ভজন,
শ্যামা মায়ের দু'টি চরণ।
(একদসু) পথে করে আক্রমণ,
অবশেষে, চরণে শরণ মাগে।।

কামার পুকুর রামকৃষ্ণ পরম হংসে,
শ্যামা সদা থাকতো মিশে।
ভাগ্নে হৃদের চোখে ভাসে।
(এ-যে) মামা নয় মোর, শ্যামা আগে।।

নাটোর রাজা রামকৃষ্ণের কথা,
মা ছিল তার হৃদে গাঁথা।
শ্যামা বলতো যথা তথা,
শুন রামা, তোর দোহাই লাগে।।

মেহের সর্বানন্দ অধিকারী,
পূর্ণদা তার সহায়কারী।
শ্মশানে জাগে শঙ্করী,
পুনর্জন্ম তার অনুরাগে।।

পাবনা কীর্তিখোলার রাজকৃষ্ণ সা,
(মা গো) যে করেছিল তোর ভরসা।
সুরাপানে, শুরু করে জিজ্ঞাসা,
(তাই) সুধা দেখায় মায়ের ভোগে।।

কুমিল্লা মনোমোহন আর আতাউদ্দিন
মাকে ডাকে তারা নিশি দিন।
লব বাবু মিলনে যে তিন,
(তাই) ত্রিণয়নী রয় সমান ভাগে।।

গ্রাম আমতা
ভবাপাগ্‌লা গানের ছলে,
ভক্ত পাশে যাচ্ছে বলে।
মা নাকি তার মাটি তোলে,
নিশায় নয় রে দিবা ভাগে।।[৩]

ভবাপাগলার প্রথম দিকের অনেকগুলি গান আমরা পাই যা মূলত রাম প্রসাদকে অনুসরণ করে লেখা; যেমন–

এস মা কালী, শুন মা বলি,
আমার প্রাণের বেদনা।
লাগে না ভাল কি যে করি,
তুমি আমায় বলনা।।[৪]

এখন থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে রামপ্রসাদ (১৭২৩-৭৫) গেয়ে শুনিয়েছিলেন, 'এবার কালী তোমায় খাব', ভবাপাগলা (১৯০০-৮৪) তাঁর অনেক পরে প্রত্যুত্তরে গেয়ে গেলেন,

মা গো এবার পেটটি ভরে খেয়েছি,
নাই কো আমার ক্ষুধার জ্বালা, তাকে তুষ্ট করেছি।।[৫]

ভবা পাগলার গানে, রামপ্রসাদ সেনের গানের প্রভাব যে কত, তা নিম্নলিখিত গানগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায়।

ক. মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী।।–রামপ্রসাদ।[৬]

তোমায় আমায় ওগো কত খেলাই হ'ল।–ভবাপাগ্‌লা।

খ. বড়াই কর কিসে গো মা,
জানি তোমার আদিমূল।–রামপ্রসাদ।

মা তোর শুষ্ঠির খবর কুষ্ঠি দেখে,
চিনে ফেলেছি।–ভবাপাগলা।

গ. সে কি শুধু শিবের সতী।–রামপ্রসাদ
সতী নারী পতির বুকে রয়।–ভবাপাগলা।

আবার বিপরীতমুখী ভাবনাও লক্ষণীয়। যেমন,–

ক. আমায় দেও মা তবিলদারী।—রাম প্রসাদ।
আমার কণ্ঠে গাহিতে দিও গান।—ভবাপাগ্‌লা।

খ. মন রে কৃষি কাজ জান না।—রাম প্রসাদ।
যদি কাজ করবি, আয় শ্যামা মায়ের কারখানায়।—ভবা পাগল।

গ. ভবে আর জন্ম হবে না,
হবে না জননী জঠরে।'—রাম প্রসাদ
মা আমাকে নূতন করে সাজাবে আবার,
মৃত্যু শেষে পুনর্জন্ম মাতৃনাম করিতে প্রচার। —ভবাপাগ্‌লা

রামপ্রসাদ সেন এবং ভবাপাগ্‌লার মাতৃসংগীত সাধনার প্রধান মৌলিক সাদৃশ্য ছিল এই, উভয়েই ছিলেন গায়ক এবং সাধক। নিজেরা মাতৃসাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, কালীকে মাতৃ বা কন্যাজ্ঞানে পূজা অর্জনা করতেন, গান রচনা করতেন, সুরারোপ করতেন, আবার সকলকে গেয়ে শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। সাধক কমলাকান্ত নিজেও গান রচনা করেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বা বামাক্ষ্যাপা নিজে সংগীত রচনায় মনোনিবেশ করেননি বটে, কিন্তু রামপ্রসাদ ও অন্যান্য সমসাময়িক কবিদের রচিত মাতৃসংগীতগুলি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত গান করতেন। ভবাপাগ্‌লার 'প্রসাদীসুর' ছিল খুবই প্রিয়, এবং প্রসাদীসুরে তাঁর অনেক গান রয়েছে। তেমনি কমলাকান্তের অনেক গানের ভাব ও বাণীর সঙ্গে ভবাপাগ্‌লার গানের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়:

ক. শ্যামা আমার কালো কে বলে,
আরে মন। কি বল।।—কমলাকান্ত[৭]

আমার কাল মেয়ে, কাল মেয়ে, কাল মেয়েই ভালরে।। —ভবাপাগ্‌লা।

খ. আর কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল কালী সার রে।—কমলাকান্ত।

তুমি কারে ভাব আপন, ওরে ভোলামন,.
দিন গেল ভাবিলি না শ্যামা মায়ের রাঙা চরণ।। —ভবাপাগল।

গ. কালী জয়, কালী জয়, করাল বদনা জয়,
বহই মন বদনে বলনা।—কমলাকান্ত।

কালী বল, কালী বল, কালী বল, মনটি আমার। —ভবাপাগলা।

ঘ. শিব হৃদে নাচিতে নাচিতে চিকুর এলুলো,
প্রেমাবেশে শ্যামাতনু অবশ হইল।-কমলাকান্ত

শিবেরে কি শিবে তুমি পিশিবে গো চরণ দিয়ে -ভবাপাগলা।

'কালো মেয়েকে' নিয়ে নজরুলের বেশ কতকগুলি কালী কীর্তন রয়েছে।

ক. (আমার) কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কে দেবে তায় ধরে।[৮]
খ. আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে, কে দিয়েছে গালি, (তারে) কে দিয়েছে গালি।
গ. আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়, দেখে যা আলোর নাচন।[৯]

ভবাপাগলাও কালো মেয়েকে নিয়ে গান লিখেছেন,

ক. কালো মেয়ে মেঘলা বরণ, চুল এলিয়ে বসে।
খ. একটি মেয়ের কথা শুনেছি
তার রঙটি কালো নাচে ভালো,
শ্বেত পথে নাচে কেবল,
তাই হৃদি পদ্ম পেতেছি। প্রভৃতি।

মোট কথা, শাক্ত সংগীতের জগতেশ্রীরামপ্রসাদ যে স্রোতধারা সৃষ্টি করেছিলেন, কমলাকান্ত ও নজরুলের ভিতর দিয়ে তা পরিপুষ্ট হয়ে ভবাপাগ্‌লা প্রমুখ কবির লেখায় তা আরও প্রসারিত হয়। রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলী এবং তাঁর অনুসারীদের গানের মধ্যে সাযুজ্যের কারণ এই, রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে 'বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা' এমনি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে—যা পরবর্তী শাক্ত কবিগণের গানের মধ্যেও ধর্মবিশ্বাসের এই বাস্তব প্রতিষ্ঠা আমরা নানা ভাবে লক্ষ্য করে থাকি। ভবা পাগলার মাতৃসংগীতগুলি, তৎকালীন সময়ে সমাদৃত হবার আর একটি কারণ হল, শাক্ত পদাবলী যে ভাষায় রচিত সেগুলি ছিল সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক ভাষা। মানুষের নিত্যদিনের কর্ম-কৃষি, বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমা, জমিদারী-তালুক, দলিল-দস্তাবেজ, লেন-দেন, বিলদারী প্রভৃতি কথা অনায়াসে স্থান পেয়েছিল সে সব গীতিকবিতায়। এই গানগুলি ছিল তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। শাক্ত সাধকগণের জীবনের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই, তাঁরা দুঃখ যন্ত্রণা দারিদ্র্যের ভয়ে সংসার ত্যাগ করে যাননি। সংসারে থেকেই মাতৃচরণে আত্মসমর্পন করে দুঃখ কষ্টকে নিবারণ করেছেন। মাতৃ সাধকগণ জানতেন, এমন কি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, "সংসারে সৃষ্টিলীলার পার্শ্বেই ধ্বংসলীলা চলিতেছে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রভৃতির মধ্য দিয়া ধ্বংসের যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, তাহাতে ভীত বা বিচলিত হইলে চলিবে না। সত্যকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিতে হইবে এবং জগদম্বার কৃপায় সর্বপ্রকার বিভীষিকাকে জয় করিতে হইবে।"[১০] সাধক ভবাপাগ্‌লার মাতৃগানগুলিতেও এই দুঃখ জয়ের কথা বলা হয়েছে। তিনি শুনিয়েছেন হতাশা থেকে পরিত্রাণের বাণী—

ছেলে কখনও ভয় পেলে, মা ঢেকে নেয় আঁচলতলে।
রাখে না সে পথে ফেলে, ছেলের মায়া সকল ভুলে।।[১১]

এবং-

যাবি চলে সুখে,ডাক আনন্দময়ী,
রিপু বস হবে শমনে হবি জয়ী।
নেবেন কোলে করি, এসে দয়াময়ী
সমনে গালি দেবে রে মন্দ।।[১২]

ভবাপাগ্‌লার জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর, এদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। এ সময় ভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়–অনুভূতির বীজ উপ্ত হয়ে উঠেছিল দস্তুর মত।

'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, 'বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন'; ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রভৃতি স্বদেশী–আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধও যেন মানুষের মনকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নিতে বসেছিল। ভবাপাগ্‌লা এসব আচরণ থেকে বিরত রাখার জন্য 'মা' কেই দায়ী করে লেখেন–

ভাইয়ে ভাইযে কাটাকাটি, মা বেট–নাক দেখছিস চেয়ে।
নিজে রইলি, কোন আড়ালে, কোলের ছেলে রণে ফেলে।।[১৩]

'কোলের ছেলে রণে ফেলে' মাকে পালিয়ে বেড়ালে চলবে না তাকে এসব মিটিয়ে দেবার ভার নিতে হবে। অষ্টাদশ শতকের মাতৃসংগীতগুলির মধ্যে আমরা প্রথম যে অসাম্প্রদায়িকতার বাণী উচ্চারিত হতে দেখি, ভবা পাগ্‌লার গানে সেই অখণ্ড ভাতৃত্ব বোধের পরিচয় আরও প্রকটিত হতে দেখা যায়। তিনি জানতেন যে, জাতি ভেদের চাইতে বড় সত্য, সকলে আমরা একই মায়ের সন্তান:

মায়ের কাছে সকল সমান
কিংবা হিন্দু, কিংবা মুসলমান।
দেবতা মানুষের বিধান,
ব্যবধানে করে গঠন।।[১৪]

রামপ্রসাদ তাঁর গানে বুঝাতে চেয়েছিলেন যিনি মাতৃভাবে কালীকে উপাসনা করেন–কালী তাঁর কাছে করালী নহেন, স্নেহময়ী আনন্দময়ী জননী। তিনিই প্রথম, "কালীকে বাঙালী ঘরের 'বিগলিত করুণা' জননীতে পরিণত করিয়াছেন। আবার আগমনী ও বিজয়ার গানে, দেখি উমারূপে তিনিই হইয়াছেন আমাদের গৃহের আদরিণী কন্যা।'[১৫]

ভবাপাগ্‌লার মানসকালী আরও বেশী স্নেহময়ী, অন্ধবাৎসল্যপ্রেমে আপ্লুতা। যে মা শুধু সন্তানকে কেবল অদরই দিতে জানে, শাসন করে না:

(মাগো) অত আদর, অত স্নেহে সব করিলি মাটি,
চোখ রাঙিয়ে করলে শাসন, হতাম আমি খাটী।।[১৬]

—তাই বলে 'অত আদর স্নেহের' পরও কিন্তু ভবাপাগ্‌লা নষ্ট হয়ে যাননি। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর মা কালী বাইরে যতই শক্তিমতি হন না কেন, আসলে ভিতরে ভিতরে চির দুঃখী। আর ভবাপাগলা সেই দুঃখিনী মায়েরই সন্তান।

—আমি দুঃখীর ছেরে, দুঃখিনী আমার মা। সারা বিশ্বে নাই মোর কেহ আমি আছি আমার মা।।

মাও কাঁদে, আমিও কাঁদি কালে কেহ ছাড়ি না।
(যখন) মায়ের কোরে নয়ন মুছি, চেয়ে থাকে আমার মা।।[১৭]

উদ্ধৃত গানের চরণগুলি থেকে আমরা যে সত্যটি অনুধাবন করতে পারি, তা হল, ভবাপাগ্‌লা তাঁর গানে গর্ভধারিণী মা এবং জগৎ জননীকে এক করে ফেলেছেন। মাতৃসাধক ভবাপাগ্‌লার এই যে মাতৃসাধনা, আর উপকরণ ছিল ফুল বা মন্ত্র নয়-গান। তিনি বিশ্বাস করতেন,

গানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা,
লাগেনা ফুল চন্দন, মন্ত্র তন্ত্রও লাগে না।।[১৮]

সহজ কথা, ভবা পাগ্‌লা তাঁর জীবনের আনন্দসঙ্গী হিসেবে গানকেই বেছে নিয়েছিলেন। শয়নে গান, জাগরণে গান গানই ছিল ভবাপাগ্‌লার নিত্য দিনের সঙ্গী। কথায় গান, আলাপে গান, এখনকি জাগতিক কর্মের মধ্যেও তিনি নতুন নতুন 'নাম গান' করতেন।

তথ্যনির্দেশ

১ অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৯৭৫
২ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা,* ঢাকা, ১৩৭৫, ভূমিকা পৃ. ৩
৩ গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী *সংগৃহীত, সংগীত সংকলন,* গান নং ৬২
৪ ঐ, সংগীত সংকলন, গান নং ৫৪
৫ তমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পরমগুরু ভবপাগ্‌লা,* ১৩৯১, পৃ. ১৪০
৬ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, *ভারতচন্দ্র ও রাম প্রসাদ,* কলিকাতা, ১৯৬৭, থেকে গানগুলি সংগৃহীত।
৭ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত *কমলাকান্তের পদাবলী* থেকে গানগুলি নেয়া হয়েছে।

৮ আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী,* ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, থেকে সংগৃহীত।
৯ ঐ, *নজরুল রচনাবলী,* ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ থেকে সংগৃহীত।
১০ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী, *শাক্তপদাবলী ও শক্তি সাধনা,* কলিকাতা–৬, ১৩৭০, পৃ.২৫
১১ গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্ত্তী সংগৃহীত, সংগীত সংকলন, গান নং ৪৮
১২ ঐ, গান নং ৫০
১৩ ঐ, গান নং ৮১
১৪ ঐ, গান নং-৯৪
১৫ *শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা,* পৃ. ২৭
১৬ *সংগীত সংকলন,* গান নং ৪০
১৭ ঐ, গান নং ৪৭
১৮ ঐ গান নং৯